International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 01-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

মেঘদূত: প্রতিভার সত্যস্বর

কানিজ ফাতেমা
গবেষক(পি.এইচ.ডি),বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

Abstract

Meghdoot is an immortal /celestial creation of the great poet Kalidasa.He is the position of Kalidasa in Sanskrit literature after the poetic Shiromoni Byas and Balmiki. He is compared to Dante and Shakespeare for his time- honored genius. Apart from Rabindranath, many European poets and writers have also been fascinated by his writings. Kalidasa's literary work has been able to satisfy their hearts. Meghdoot is the prode and ornament of entire Sanskrit lyric poetry, according to some, the original creation of beauty.The poem Meghdoot is the shortest and most popular work of Kalidasa. Kalidasa the creator of Meghdoot, was a prominent classical Sanskrit poet and playwright. But it is sad but true that no reliable information is available about the life story of Kalidasa. Kalidasa's writings reflect the image of an aristocratic society in ancient India. He enriched the Sanskrit lan guage and gave it a special status. He has used about thirty verses in this poems.The total number of verses im Meghdoot Kavya is 118. The famous commentator Mllinath has divided the kavya into two parts. East cloud and north cloud. The number of verses in the eastern cloud is 64 and the number of verses in the northern cloud is 65. The great poet Kalidasa has been able to express the thoughts of hundreds of people through the presence of only two characters. Meghdoot is impeccable in terms of form. The narrative of this poem is like a circle. The strong sense of tradition smong Kalidasa can be seen im his poetry. The main reason for the eternity of Meghdoot poetry is its detachment. The story of happiness of all people is one but the type of Separation is different. That is why Aristotle called tragedy is tge best literary work. In the writing of kalidasa the glory of sacrifice has prevailed over enjoyment. In the separation of priya, the separation phase of Yaksha has been shown to be enlarged and gradually the separation of Yaksha has been able to unite with pain of human separation.

Key words: Meghdoot, Kalidasa, genius, Sanskrit, cloud.

‘মেঘদূত’ মহাকবি কালিদাসের অবধারিত ও অনিবার্য সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার প্রাণ-রাসায়নিকতায় সৃষ্ট। সংস্কৃত সাহিত্যের স্পন্দনকে ধারণ করে বেড়ে ওঠা ‘মেঘদূত’ একজন ঐন্দ্রজালিক সত্তার ছোঁয়ায় সহৃদয়সংবেদী-মননবুদ্ধ পাঠকের মনে অদ্ভুত অনুরণন সৃষ্টি করে। অনির্ণেয় অনুভূতি-সংবেদনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে তিনি পাঠককে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়ে একটি মৃত ভাষার সাহিত্যকে জীবন্ত ও চিরন্তনতা দান করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি কবিকুল শিরোমণি, বাণীর বরপুত্র, মহাকবি

কালিদাস। ব্যাস ও বাল্মীকির পরেই সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের অবস্থান। দান্তে ও শেক্সপিয়ারের সাথেও তাকে তুলনা করা হয় তাঁর কালজয়ী প্রতিভার সঠিক উপমা দান করবার জন্য কিন্তু কালিদাস ছন্দস্পন্দ,শব্দশৃঙ্খলা,বাক্যিক গঠন,গড়ন, উচ্চারণ-কথন, অলংকার ইত্যাকার কাব্যিক রূপকল্পের মিথস্ক্রিয়ায় এমন এক নান্দনিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন যেখানে তিনি সবার থেকে স্বতন্ত্র, স্বমহিমায় উজ্জ্বল। হিমালয়ের মতো বিশালত্ব ও বিস্তার নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন কাব্যদেবীর হৃদয়-মন্দিরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও অনেক ইউরোপীয় সহিত্য-সুধাপিপাসু সাহিত্যবিশারদগণ কালিদাসের সৃজনক্ষমপ্রজ্ঞার সম্মুখ-পানে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছেন। আর তাঁর প্রতিভা-সমুদ্রে ডুব দিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ মুণি-মুক্ত পেয়ে তুষ্ট থেকেছেন, পুঞ্জীভূত মেঘমালার খানিক বর্ষণে উড়ন্ত-ইন্দ্রিয় ও ভাসন্ত-অনুভূতিকে তৃপ্ততা দিয়েছেন। কিন্তু কালিদাস উড্ডীয়মান-শিহরিত-বিলোড়িত-অন্তঃশীলিত বোধ ও উপলব্ধির গাঢ়-গূঢ় অন্তর্বয়নে ঋদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী। 'মেঘদূত' সেই ঋদ্ধতা ও সমৃদ্ধির-ই কাব্যিক-বয়ান।

প্রজ্ঞার দীপে প্রজ্জ্বলিত 'মেঘদূত' কালিদাসের শিল্পনিয়নদীপের জিয়ন কাঠি স্বরূপ। সেই সাথে সমগ্র সংস্কৃত গীতিকাব্যের অহংকার ও অলংকার, কারো কারো মতে 'সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি' । কাব্যখানি কালিদাসের সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও জনপ্রিয় রচনা। মানবমনের চিরন্তন অনুভূতির জারক রসে জারিত এ কাব্যখানি সর্বাঙ্গীন ভাবে অনবদ্য এবং সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মাঝে তুলনাহীন গঠনশৈলী ও অর্থাতীত অনির্ণেয় সূক্ষবোধের জন্য সহৃদয় হৃদয়বানের নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে শত শত বছর ধরে। মেঘদূতের দ্যুতি এতই দীপ্তময় যে, তিনি যদি আর কিছু না লিখে শুধু মেঘদূত লিখতেন তবু তাঁর কবি খ্যাতি অক্ষুন্ন থাকত। কথাটি একটু অন্য ভাবে 'মেঘদূতের' অন্যতম অনুবাদক বন্ধুদেব বসু বলেছেন- 'কালিদাস যদি 'মেঘদূত' না লিখতেন তাহলে আজ পর্যন্ত সারা ভারতে তাঁর নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হতো না।' হাজার বিধি-বিধানের বেড়াজাল মেনে নিয়েও যে প্রতিভা তার সত্যস্বর শোনাতে পারে, লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ-কৃত্রিম আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কবিতার কবিতা হয়ে ওঠার উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'মেঘদূত'।

মেঘদূতের স্রষ্টা কালিদাস ছিলেন ধ্রুপদি সংস্কৃত ভাষার এক বিশিষ্টি কবি ও নাট্যকার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, কালিদাসের জীবনকাহিনী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তি অনুসারে প্রথম জীবনে তিনি অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ ছিলেন, যার দরুণ তাঁকে সর্বদা বিদূষী স্ত্রী কর্তৃক গঞ্জনার স্বীকার হতে হতো। একদিন তা মাত্রা ছাড়ালে তিনি প্রচ-অপমানিতবোধ করেন এবং আত্মহত্যা করতে উদ্ধত হন। কিন্তু দেবী সরস্বতী মতান্তরে কালীদেবী কর্তৃক বরপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সর্ববিদ্যালাভে সক্ষম হয়ে ওঠেন এবং চিরতরে তাঁর মূর্ছাভঙ্গ ঘটে। এবং ধীরে ধীরে তিনি বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, দর্শনশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মধ্যে অভিনব কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনা করেন এবং তাঁর রচনায় অধীত বিদ্যার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এভাবেই একজন মূর্খ কবি পরিণত হন মহাকবিতে। কালিদাসের রচনাসমূহে প্রাচীন ভারতের এক অভিজাত সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে সমৃদ্ধ করে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাঁর কাব্যে প্রায় ৩০টির মতো ছন্দ ব্যবহার করেছেন। শিল্পরূপময়তা, অর্থের গভীরতা ও কল্পনার ব্যাপকতা তাঁর সকল রচনাকে রসোত্তীর্ণ করেছে। তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকের ইংরেজি অনুবাদের (১৭৮৭) মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রথম ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এবং অসাধারণ কবিপ্রতিভার জন্য কালিদাসকে হোমার, শেক্সপিয়ার, মিলটন, দান্তে, গ্যেটে, ভার্জিল প্রমুখ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকের সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করে আলোচান করা হয়ে থাকে।[১]

তাঁর সময়কাল নিয়ে দুটি মত প্রচলিত রয়েছে। প্রথম মতে, তিনি খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্রম নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র ছিলেন শুঙ্গবংশীয় রাজা, যাঁর শাসনকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫-৪৮ অব্দ। অপর মতে, তার সময়কাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে। বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সমধিক। কালিদাসের বহু রচনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, রাজধানী উজ্জয়িনী ও রাজসভার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থে কালিদাসের সপ্রশংস উল্লেখও রয়েছে। মেঘদূতম ছাড়াও কালিদাস কুমারসম্ভবম্, রঘুবংশম, ঋতুসংহার, শৃঙ্গাররসাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক, পুষ্পবাণবিলাস নামক কাব্য, নলোদয় ও দ্বাদশ-পুত্তলিকা নামে দুটি আখ্যানকাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশীয়ম, মালবিকাগ্নিমিত্রম নামে তিনটি নাটক রচনা করেন।[২] প্রতিটি কাব্যের মাঝে পুঞ্জীভূত সুধারস-¯স্রোতে অবগাহন করে আজও নিবৃত হয় কাব্যপ্রেমী পাঠকের পিপাসা। অনুভব-প্রজ্ঞায়-মননে-বয়ানে এই সকল সাহিত্য পার্থিব সত্তাকে বিমূঢ় ও মুগ্ধ অনুরণনের মাঝখানে ফেলে দেয়। যা তাকে

দুঃখ-দুর্দশা-দানবীয় সংঘাত, ক্ষুধা-দারিদ্র, যুদ্ধ বিদ্ধস্ত জনপদ ও স্বার্থান্বেষী মানুষের মৃত মনন-জাত সমাজের মাঝেও বাঁচতে শেখায়; কল্পলোকের স্বল্পালোকিত প্রভা-ঝরা ঝরনায় নিভৃতে ভিজে শীতল ও তৃপ্ত হবার সুখ দেয়। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জীবনের চোরাগলিতে আটকে পড়া ধাতবে অবরুদ্ধ মানুষের বিমূঢ় আর্তিতে, ঘোর লাগা চৈতন্যে ও উদগ্র বাসনায় কালিদাসের কাব্য-জগৎ জ্যোৎস্নালোকিত মায়াবী আচ্ছন্নতায় ভরে দেয়। 'মেঘদূত'তার মাঝে অন্যতম।

মেঘদূত কাব্যের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। কাজে অবহেলার দরুণ প্রভুশাপে এক যক্ষ অলকা হতে রামগিরিতে দীর্ঘ এক বছরের জন্য নির্বাসিত হয়। আট মাস অতিক্রান্ত হবার পর আকাশে নবীন মেঘ দেখে বিরহী যক্ষের মন হাহাকার করে ওঠে তার বিরহীনি স্ত্রীর জন্য। বিরহাক্রান্ত যক্ষ সেই মেঘকেই দূত করে পাঠায় প্রেয়সীর কাছে অলকা পুরীতে। 'মেঘদূত' কাব্যে বিরহী হৃদয়ের বার্তাই আশ্চর্য কাব্যরূপ লাভ করেছে। বিরহ মানব-মনের শাশ্বত এক অনুভূতির নাম। সৃষ্টির শুরু হতে প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য-বঞ্চিত একাকীত্ব এ বিরহের সঞ্চার করে। এ কাব্যের আবদেন তাই চিরন্তন ও সর্বজনীন।
'মেঘদূত' কাব্যে মোট শ্লোক সংখ্যা ১১৮ টি। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ এই কাব্যটিকে দুই অংশে ভাগ করেছেন-পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘ। পূর্বমেঘে শ্লোক সংখ্যা ৬৪ টি [১-৬৪], আর উত্তর মেঘে শ্লোক সংখ্যা ৬৫ টি [৬৫-১১৮]। রামগিরি থেকে অলকার পূর্ব-পর্যন্ত যাত্রাপথের মনোরম বর্ণনা পূর্বমেঘ নামে খ্যাত। আর 'উত্তরমেঘ' এর পটভূমি অলকা- যা সৌন্দর্যের লীলাকেতন, নিত্যানন্দের বিহার ভূমি। 'মেঘদূত' পড়লে মনে হয় আগাগোড়া ভেবে নিয়েই কবি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং শ্লোকের সমুদ্র মন্থন করে; পরিবর্তন, পরিশোধন ও পুনলিখনের পরিশ্রম স্বীকার করে কালিদাস কবিতাটিকে সাঁজিয়েছেন। কাব্যটির বিষয়ে অগভীরভাবে চিন্তা করলেও কবির মিতাচারে মুগ্ধ হতে হয়; কারণ সংস্কৃত কাব্যের প্রধান অভিশাপ যে-বাগবাহুল্য তা থেকে এটি লক্ষণীয়ভাবে মুক্ত। একটি গর্বিত মক্ষম নৌকোর মতো নিটোল ও নিখুঁত এর গড়ন, কোথাও এতটুকু বাহুল্য বা অতিশয্য নেই।[৩] কবি স্বল্প কথায় বলেছেন সবটুকু আর দুটি মাত্র চরিত্রের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে শ্বাশত মানবের অন্তর নিঙড়ানো আর্তি প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। এখানেই কবির চরিত্রায়ণ কৌশলের চমৎকারিত্ব। এতে মূলত দুটি চরিত্র রয়েছে- একজন বক্তা, অন্যজন শ্রোতা। বক্তা হচ্ছে যক্ষ এবং শ্রোতা মেঘ। যক্ষ কবির অসাধারণ সৃষ্টি। চরিত্রটিকে কবি আবহমান বিরহী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যক্ষ সাধারণ দেবযোনি বিশেষ। কিন্তু কবির সৃষ্টি নৈপুন্যে যক্ষ পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠেছে। এ কাব্যের অপর চরিত্র মেঘ। পুষ্কর আবর্তের বংশজাত এ মেঘ জড় হয়েও কবির অনুপম কল্পনা প্রতিভার দ্বারা জীবন্ত একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। যার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে যক্ষ তথা কবির অভিপ্রায়।

'জনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলো ব'লে শাপ দিলেন প্রভু
মহিমা অবসান, বিরহ গুরুভার ভোগ্য হলো এক বর্ষকাল;
বাঁধলো বাসা রামগিরিতে, তরুগণ ¯স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে,
এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতিমেখে পুণ্য।' [শ্লোক-১]

আঙ্গিকের দিক থেকে 'মেঘদূত' অনবদ্য। এ কাব্যের অখ্যান যেন একটি বৃত্ত বা বলয়। এর দৃশ্যপটের ক্রম-পরিবর্তনে এক ধরনের নাটকীয়তা দেখা যায়। যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয় সেখানেই যাত্রা শেষ। অথচ মাঝখানে পাঠকেরা মেঘের সহযাত্রী হয়ে সমগ্র বিশ^ পরিভ্রমণ করে আসে। এক আশ্চর্য আঙ্গিক কৌশলের মাঝে বেঁধে কবি কাব্য ও পাঠককে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল মাঝে অবস্থিত সকল নিরঙ্কুশ সৌন্দর্যের সামনে দাঁড় করান এবং সৌন্দর্যের সকল প্রকার ঐশ্বর্য আহরণে বাধ্য করেন। অভূতপূর্ব ব্যাপর হলো আঙ্গিকের ন্যায় আশ্চর্য কৌশলে কবি বিন্যস্ত করেছেন সময়কে। আষাঢ়ের প্রথম দিন মেঘের যাত্রা শুরু হয়। অনেক গিরি-পর্বত, নদী-নালা, জনপদ পার হয়ে অলকার সৌন্দর্য দর্শন করে, যক্ষ প্রিয়াকে বার্তা দিয়ে ফিরে আসে মেঘ। মনে হয় যেন কতটা সময় এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে। কিন্তু এটা আষাঢ়ের প্রথম দিনের কয়েক ঘন্টা সময়ের কাহিনী মাত্র। সময়ের অটুটগ্রন্থনের মাঝে ধেয়ে চলা 'মেঘদূত' কাব্যের গড়ন একটি পিরামিডের মতো। যার পাদদেশে ভৌগলিক বিবরণ, মধ্যভাগে অলকা, আর তার চূড়ায় অধিষ্ঠিত এক নারীমূর্তি। সামাগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিটি অংশ সুষমভাবে বিধৃত হয়েছে। এ কারণে 'মেঘদূত' তুলনাহীন। তুলনাহীন এ কাব্য যে গুণে পাঠককে আদ্যন্ত ধরে রাখে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে গতি। যে চিত্র শ্রেণি মেঘদূতের মূল বর্ণনার বিষয় তাতে একটি গতির আবেগ আছে। দৃশ্যপট পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পাঠকের মনও এগিয়ে যায়। এই গতি-ই মেঘদূত কাব্যের প্রাণশক্তি। এইটুকু না থাকলে সমস্ত কাব্যটি বর্ণবৈভবহীন নিশ্চেতন সৌন্দর্যের আধার হতো মাত্র। 'মেঘদূত' কাব্যকে প্রাণবান বা সচল করেছে যে গতি, সেই গাতিবাহক মূলত তার

অজস্র চিত্র। কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ বলেন, 'মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল এই চিত্র পরম্পরায়। কেবল চিত্র-ছবির পর ছবি।"[৪]

"উত্তোলিত বাহু বন্য তরু যেন, নৃত্যে উদ্যত শম্ভূ
তখন হবে তুমি সন্ধ্যাকিরণের জবায় রক্তিম মন্ডল; [শ্লোক-৩৭]
অথবা
দেখবে যেতে যেতে স্খলিত, মনোরম ভঙ্গি নেয় নির্বিন্ধ্যা
ঢেউয়ের সংঘাতে মুখর বিহগেরা রচনা কওে তার কাঞ্চীদাম;
ঘূর্ণি নাভি তার দেখায়, তুমি তাই সরস হবে তার সন্নিপাতে
জানো তো হাবেভাবে আদ্য অনুরাগ হানায় দয়িতেরে প্রমদা।[শ্লোক-২৯]

অনন্য প্রতিভার অধিকারী হলেও কালিদাসের মধ্যে ঐতিহ্যবোধ প্রবল। তাঁর রচনায় পূর্বসূরীদের প্রভাবের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সমালোচকগণ তাঁর রচনায় বাল্মীকি, অশ্বঘোষ প্রমুখ কবির প্রভাব খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে ব্যাপকভাবে সে গ্রন্থের তিনি অনুসরণ করেছেন সেটি বাল্মীকির-রামায়ণ। মেঘদূত কাব্যের উৎসও খুঁজে পাওয়া যায় বাল্মীকিতে। তবু সকল প্রকার প্রভাব ও ঋণ থাকা সত্ত্বেও প্রতিভা তার সত্যস্বর শোনাতে ভোলেনি, কাব্যলক্ষ্মীর অপার কৃপায় কালিদাস 'মেঘদূত' রচনা করতে সক্ষম হন; যা সম্পূর্ণ অভিনব, অনবদ্য ও মৌলিক। তিলোত্তমার ন্যায় কবি 'মেঘদূত' সৃজন করেছেন। পৃথ্বী-শ্রেষ্ঠ সকল কাব্যের অনন্য সব বৈশিষ্ট্যের সাথে সাজুজ্য পাওয়া যায় এ কাব্যের। একারণে 'মেঘদূত' কোন শ্রেণির কাব্য তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। সংস্কৃত সমালোচকেরা আকৃতিগত দিক থেকে একে খণ্ডকাব্য বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর স্বর্গ- মর্ত্য ব্যাপী বিশাল পটভূতির কারণে মহাকাব্য বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু একে প্লটহীন আধুনিক উপন্যাসের সাথে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'বন্দীহৃদয়ের বিশ্ব ভ্রমণ' বলে উল্লেখ করেছেন। মেঘদূতকে নাটক গীতিকাব্য, মহাখাব্য, খণ্ডকাব্য, ক্ষুদ্রকাব্য- যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন; এ কাব্য একক ভাবে তার কোনটাই নয় বরং সবগুলোর লক্ষণ-ই অল্প-বেশি অঙ্গে ধারণ করে 'মেঘদূত' মোহনীয়, কমনীয় ও আত্মা-মোহিতকারী কাব্যরূপে পাঠককূলের নিকট আপনাকে বিকশিত করে দণ্ডয়মান রয়েছে। এই শক্ত অবস্থানের পিছনে রয়েছে এর চরম নাটকীয়তা গুণ। নাট্যকার হিসেবে কালিদাসের কৃতিত্বের ঝলক মেঘদূতের মাঝেও দেখা যায়। বর্ণনা প্রধান সংস্কৃত সাহিত্যের কবিতা হলেও নাটকীয়তার গুণে মেঘদূতের বর্ণনা স্থবিরতার অভিশাপ থেকে রক্ষা পেয়ে ছুটে চলে দিগ-দিগান্তরে। 'মেঘদূত' পড়তে গিয়ে মনে হয় যক্ষের ধারাভাষ্যে আমরা রঙ্গমঞ্চে তার-ই বাস্তবরূপের প্রকাশ দেখছি। অর্থাৎ বর্ণনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নাটকীয় ক্রিয়া মেঘদূতের মহিমাকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবার পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

'রয়েছে চার মাস, যাপন করো তুমি ধৈর্যে, নিমীলিত নয়নে,
বিষ্ণু উঠবেন শয্য ছেড়ে তাঁর, আমার হবে শাপমুক্তি;
তখন পরিণত শরৎ-জ্যোৎস্নায় মিলনপুলকিত রাত্রে
পূর্ণ হবে সব, বিরহসঞ্চিত যা-কিছু আমাদের অভিলাষ।'[শ্লোক-১১৩]

'মেঘদূত' একটি দূত কাব্য। শুধু সংস্কৃত সাহিত্য নয় ফরাসী সাহিত্যে দূতের বিশেষ মর্যাদা লক্ষ করা যায়। দীর্ঘকাল করে চীন, ভারত, ইরানসহ প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের সাহিত্যে দূত একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু কালিদাসের 'মেঘদূত' দূতকাব্য রূপে এক মহত্তম সৃষ্টি। এ কাব্যকে অনুসরণ করে পরবর্তী কালে অসংখ্যা দূতকাব্য রচিত হয়েছে। সেগুলোর মাঝে আছে ধোয়ীর 'পবনদূত', জম্বুর 'চন্দ্রদূত', রূপ গোস্বামীর 'হংসদূত', কৃষ্ণসার্বভৌমের 'পদাঙ্কদূত', রুদ্রের 'ভ্রমরদূত',বজ্রনাথের 'মনোদূত' অন্যতম। এছাড়াও রয়েছে অজস্র দূত কাব্য। তবে তা কাল ও প্রভাবের বেড়াজাল ভেদ করে আপন আলোয় উদ্ভাসিত হবার শক্তি পায়নি। আর সে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 'মেঘদূত' অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য ও দুর্বার গতিতে শত শত বছরের কংক্রিট কঠিন আস্তরণ ভেদ করে আধুনিক সময়ের বুকেও উজ্জ্বল হয়ে অবস্থান করছে ।

"হে মেঘ,জানি আমি ভুবনবিশ্রুত তুমি যে পুষ্কর-আবর্তের
বংশে জাত, আর সেবক ইন্দ্রের,ইচ্ছামতো নাও নানান রূপ।
দৈব প্রতিকূল,বন্ধু বহুদূরে, তোমার কাছে আমি প্রার্থী,
গুণীরে অনুনয় বিফল সেও ভালো, অধমে বর দিলে নিতে নেই।'[শ্লোক-৬]

আর এই অবস্থানের পিছনে রয়েছে শাশ্বত ও চিরন্তনতার পাথেয় সংগ্রহ করার কৌশল। কবি কালিদাস আপন হৃদয়ের সকল ব্যাথা নিঙড়ে পুরে দিয়েছেন কাব্যটির বক্ষে । সে ব্যাথার তীব্রতা এতো প্রবল যে তা সহজেই সংক্রামিত করে ফেলে চারপাশের সজিব হৃদয়সমূহকে। 'মেঘদূত' কাব্যের চিরন্তনতার মূল কারণ এর মাঝে প্রোথিত বিরহবোধ; নববর্ষা-বাহিত বিরহের যে অব্যক্ত বেদনা যুগযুগান্তর ধরে প্রেমিকহৃদয়কে উদ্বেলিত করে থাকে, সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন বিরহের অনিরুদ্ধ ব্যাকুলতাই এই অপূর্ব কাব্যে শাশ্বত বাণীরূপ লাভ করে ধন্য হয়েছে। "অবশেষে রাজা-রানী সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করিতে লাগিল"-সুখের স্বরূপ এমনি, তাকে একটি চরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়। সব মানুষের সুখের কাহিনীই একই রকম কিন্তু প্রতিটি মানুষের বিরহের ধরন ভিন্ন ভিন্ন। যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকগণ বৈচিত্রময় এ জগতের কথা, অনুভূতির কথা বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করেছেন। বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই বিরহের। অর্থাৎ Happy ending বলতে যা বোঝায় তা নয়। এ কারণে ট্রাজেডিকে এরিস্টটল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম বলেছেন। 'মেঘদূত' সেই সব শ্রেষ্ঠ কাব্যের একটি, যার মাঝে মহাকবি কালিদাস যক্ষের বিরহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে চিরকালীন মানুষের বিরহবোধের প্রকাশ করেছেন। বর্ষার সাথে বিরহের এক নিবিড় ও আন্তরিক সম্পর্ক বিরাজমান এবং বিশ^ সাহিত্যে কবি কালিদাসই তা প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর নায়ক যক্ষ আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ দেখে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে প্রিয়ার কথা স্মরণ করে। বিরহী যক্ষ শুধু নয় কবির মতে, মেঘ দেখলে সুখী লোকের চিত্তও উন্মনা হয়ে পড়ে।

"নবীন মেঘ দেখে মিলিত সুখীজন তারাও হয়ে যায় অন্যমনা।" [শ্লোক-৩]

আট মাস প্রিয়া বিচ্ছেদে কাতর, চেতন-অবেতনের ভেদাভেদ লুপ্ত যক্ষ অচেতন মেঘকে সবিনয় অনুরোধ করে তার ব্যাকুল হৃদয়ের বার্তা যেন মেঘ তার প্রেয়সীর কাছে পৌঁছে দেয়।

"প্রিয়ার বাহু থেকে কঠিন বিচ্ছেদ কুপিত ধনপতি ঘটলেন,
আমার সমাচার, পয়োদ, নিয়ে যাও, তুমি যে তাপিতের আশ্রয়।" [শ্লোক-৭]

বর্ষাকাল, হলো ঘরে ফেরার কাল, জীবীকার তাগিদে দেশদেশান্তরে চলে যাওয়া মানুষেরা কর্মহীন বর্ষাকলে ঘরে ফেরে। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। সারা বছরের বিচ্ছেদ যাতনা সয়ে এসময় পথিক-বনিতারা অপেক্ষা করে তার প্রিয়তমের জন্য। যেমন ভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে যক্ষপত্নী। যার প্রতি মুহূর্ত কাটে যক্ষের ঘরে ফেরার প্রত্যাশায়। নববর্ষায় তাই যক্ষের ভাবনা তার প্রিয়াকে নিয়ে।

"যখন আরোহন করবে বায়পথে, পথিকবনিতরা অলক তুলে
গভীর প্রত্যয়ে দেখবে তোমাতেই প্রিয়ের আগমন-আশ্ববে।
আমার মতো নয় সে-জন পরাধীন, বলো তো কি পারে দয়িতার
বিরহভাবাতুর ব্যাথা না-করে দূর গগনে তুমি সরে উদিত?" [শ্লোক-৮]

নিদারুন বিরহ-বেদনায় যক্ষ যতই কাতর হয়েছে, ততই তার ভাবনা গভীর হয়ে তার একাকিনী প্রিয়ার কথা স্মরণ করে নিজে সে যতই যাতনা ভোগ করে, ততই যে উতলা হয় তার প্রিয়াকে তার বার্তা পাঠানর জন্যে।

"অবাধ গতিনা, জলদ, চলে যাও, যেখানে একমনা ভ্রাতৃবধূ,
দিবস-গণনায় এখনো বেঁচে আছে-বন্ধু, তুমি তাকে দেখবে। [শ্লোক-১০]

এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়, যক্ষের ভাবনা যতটা তার প্রেয়সীর জন্য ততটা তার নিজের জন্যে নয়। আপন বেদনার চেয়ে আত্মজার বিরহ তার কাছে অনেক বেশি তীব্র হয়ে ওঠেছে; এ কারণে নদী, নারী, পর্বত, ফুল, ফল ও পুণ্যের লোভ দেখিয়ে মেঘকে তার বার্তা বাহক হবার আকুল আবেদন জানায় যক্ষ।

"সোম্য'হবে তুমি আমার বান্ধুব? আছো কি সম্মত কার্যে?
নিরুত্তর যদি, তুবও সংশয় করি না আপনার সাধুতায়;" [শ্লোক-১১৭]

যক্ষের মুখে যক্ষপত্নীর বিপ্লুত-বেদনাক্রান্ত বিরহ-দশা শ্রবণ করে পাঠক অধিক করুণা-বিগলিত হয়ে পড়ে। ভোগ বিলাস, রতি-রসে ভাসমান কল্পলোক ও ঐশ্বর্যময় অলকাপুরীর চিত্রের বৈপরীত্যে সে বেদনা দুঃখের বৈকি। যেখানে বৃক্ষ সদা পুষ্পিত থাকে, পদ্মের বিকাশে আলোকিত হয় চারিধার, পাখির কলোরবে প্রাণ-চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রকৃতি, জ্যোৎস্নার আলোয় নেশাতুর

হয়ে ওঠে সুন্দর-সন্ধ্যা, রঙধনু হতে রঙ নিয়ে ডালিম, শিরীষ, কদম ফুল সজ্জিত করে নিজেকে; সেখানে পান্ডুর-মুখের ক্রন্ধনরত যক্ষপ্রিয়ার অবস্থান দুর্দদমীয় বিরহের সঞ্চার করে। আধুনিক সময় এ দুঃখকে খানিক কটাক্ষ করলেও , যে অলকাপুরীতে লিবিডোর তাড়না ব্যতিত কোন চাহিদা নেই আর মান ভাঙানোর ক্লেষ ছাড়া কষ্ট নেই সেখানে বিরহিনী যক্ষপত্নীর উৎকণ্ঠায় ওষ্ঠ্যগত প্রাণ-যাতনা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

"আমি যে সহচর রয়েছি দূরে, তাই একেলঅ যেন এক চক্রবাকী,
কৃচিৎ কথা বলে, দীর্ঘ দিনমান কাটায় মোর উৎকন্ঠায়।" [শ্লোক-৮৬]

তন্বী, শ্যামা, সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা, চাকতহরিণী প্রেক্ষণা, নিতম্বভারে মন্দগতি, স্তনাভারে নত, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম সেই যুবতী প্রতিমা বিরহে আজ শীর্ণ, পতির বিরহে মলিন তার বেশবাস, শয্যা তার ভূতলে, কেশদাম বিবর্ণ, কর্কশ রাত্রীর নির্ঘুম দেহ তার প্রসাধনহীন । পতি-বিচ্ছেদের বেদনায় বিহ্বল বালার যন্ত্রণা এতই করুণ যা প্রাণহীন মেঘকেও কষ্টে আদ্র করতে সক্ষম।

''তোমার সহচর, যদিও বিরহিত, জীবিত আছে রামগিরিতে,
অবলা, তোমাকে সে কুশল জিজ্ঞাসা," [শ্লোক-১০৪]

অবশ্য শুধু যক্ষ বা যক্ষপত্নী নয়, প্রিয়র জন্য বিরহী সকলে, চাতক বিরহী চাতকীর জন্য, বেনীর মতো ক্ষীণ নদী অপেক্ষমান মেঘের জন্য, গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ খেত বিরহী বর্ষণের জন্য, বিরহী সেই খন্ডিতা নারী যার পতি প্রতিরাত কাটায় অন্য পরনারীর সাথে, বিরহিনী সব পথিকবণিতারা যাদের পতিরা থাকে প্রবাসে অর্থাৎ প্রিয় বিচ্ছেদে বিরহী সমস্ত ধরণী। কালিদাস যক্ষের বিরহ বেদনাকে সার্বজনীন রূপ দিতে ক্ষম হয়েছেন। রামাগরি থেকে অলকা পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি ও বিশ্ব জগৎ বিরহাতুর যক্ষের সমব্যাথী। এ কাব্যে বিরহ বিশ্বব্যাপী সার্বভৌম রূপ লাভ করেছে। যদিও 'মেঘদূত' কাব্যের অন্যতম অনুবাদক বুদ্ধদেব বসুর মতে, "মেঘদূত যেখানে আমাদের সবচেয়ে নিরাশ করে, সেটি তার বিরহ প্রসঙ্গ । ...মেঘদূতে কোনো ব্যর্থতাবোধ নেই।" এ ধারণা করার কারণ, যক্ষ একজন libido-ভারাতুর জীব, তার প্রেমের ধারণা শৃঙ্গারবাসনাতে সীমাবদ্ধ। উত্তরমেঘের শেষ ভাগের কিছু শ্লোক বিলাসী নাগরের সযত্নলালিত সুগন্ধী প্রেমপত্রের মতো মনে হয়। কিন্তু যে কাব্যের রচনা উৎস কেবল ভোগলালসামত্ত রাজাকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করা, সেখানে কিছুটা আদিখ্যেতা দেখান মোটেও গর্হিত নয়। সাহিত্য মূলত সময়ের কণ্ঠস্বর। সময়ের দাবীকে মিটিয়ে যে সাহিত্য চিরকালের বুকে স্থায়ী আসন গড়ে তুলতে পারে; তা-ই উত্তম। যক্ষ ও যক্ষপত্নীর বিরহ-বেদন ধুলি-মলিন পৃথিবীর মানুষের বিরহ বেদনার রূপক। নতুবা এমন অমর বাণী উচ্চারিত হতো না কবির কণ্ঠ হতে-

"এমন কেবা আছে, নিত্য দুঃখ বা নিয়ত সুখ জোটে ভাগ্যে,
কখনো উত্থান, কখনো অবনিত, বক্রনেমি যেন মানবদশা।" [শ্লোক-১১২]

এ বাণী চিরন্তন। পাপ ও পঙ্কিলতায় এ ধরা ভরা থাকলেও মানুষ প্রতিনিয়ত সত্য ও সুন্দরের উপসনা করে। প্রতিমুহূর্তে সে সংগ্রামরত থাকে পবিত্র ও প্রেমময় নীড়ের সন্ধানে। রাত ও দিনের মতো চক্রাকারে মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ খেলা করে। এবং দুঃখ অনিবার্য জেনেও কোন প্রাণী ক্ষণকালের জন্য দুঃখের দহনে দগ্ধ হতে চায় না। Love reckons hours for months, and days for years; and every little absence is an age.[৫] অর্থাৎ বিরহের প্রতিটি মুহূর্তকে-ই অনন্ত বলে মনে হয়। যেমন মনে হয়েছে যক্ষের। তাই তার শেষ কামনা মেঘের কাছে-

"কখনো না ঘটুক তোমার বিদ্যুৎ প্রিয়ার ক্ষণেকের বিচ্ছেদ।" [শ্লোক-১১৮]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যক্ষের ব্যক্তিগত বিরহের প্রকাশরূপ না দেখে বিশ্বের সকল প্রেমিক হৃদয়ের বিরহ-বেদনার শাশ্বত প্রকাশ বলে উপলব্ধি করেছেন-

"কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছ আপন আঁধার স্তরে স্তরে

সঘনসংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।”[৬]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও মনে করেন- মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে রেবা নদীর তীরে মালতিকার দেশে, তার প্রিয়ার কাছে।’৭মূলত ‘মেঘদূত’ বিরহের কাব্য, এ বিরহ যক্ষের, এ বিরহ তার প্রিয়ার এবং বক্তিকে অতিক্রম করে এ বিরহ সার্বজনীন।

কালিদাস মিলন প্রত্যাশী এ বিরহ গাথাকে দারুণভাবে সজ্জিত করেছেন অলংকারের দ্বারা। যা অলংকার নয় তা পর্যাপ্ত নয়-এই মৌল ধারণা নিয়ে সংস্কৃত কাব্যবিচারের আরম্ভ। অলংকারহীন সংস্কৃতকাব্যের কথা অকল্পনীয় বিষয়। একারণে রসতত্ত্বের সংস্কৃত নাম অলংকারশাস্ত্র, ‘অলংকার’ মানে যথেষ্টীকরণ। যার দ্বারা কোনো জিনিস যথেষ্ট হয়ে ওঠে। ভঙ্গিকে নির্দিষ্ট ও নিয়মাবদ্ধ করে তোলাই সমগ্র অলংকার শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মল্লিনাথ কালিদাসের কাব্যে এতো বিচিত্র অলংকার খুঁজে পেয়েছেন যে, সেখানে অংলকারহীন একটি বাক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বুদ্ধবেদ বসুর মতে, ‘কালিদাস সর্বান্তঃকরণে অলংকারে বিশ্বাসী।’ তবে তাঁর অলংকার প্রয়োগ কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেনি। আর উপমা অলংকার প্রয়োগে কালিদাসের বিশিষ্টতা সর্বাধিক। একারণেই বলা হয়ে থাকে, ‘উপমা কালিদাস্য-ভারবেরর্থ গৌরবম।’ অর্থাৎ কালিদাস উপমায় শ্রেষ্ঠ এবং ভারবি অর্থগৌরবে শ্রেষ্ঠ। তুলনার উপর ভিত্তি করে কাব্য সাহিত্য যে প্রচুর অলংকার সৃষ্টি হয়েছে সেসব অলংকারকেই উপমা বলা হয়ে থাকে। উপমা হচ্ছে দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের ফলে সৃষ্ট চমৎকৃতি। মহাপন্ডিত পাণিনি, কাত্যায়ণ, পতঞ্জলি প্রমুখ মনীষিগণ উপমা অলংকারকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন। এই ‘উপমা’ প্রয়োগে কালিদাসের কবি-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। উপমা সকল কবিই প্রয়োগ করে থাকেন; ভারবি, ভবভূতি, ভাস, অশ্বঘোষ সকলেই উপমার আশ্রয় নিয়েছেন, তবু কালিদাসের উপমার প্রসিদ্ধিই সর্বাধিক। সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন পাঠক মাত্রই বলে দিতে পারেন, কোন উপমাটি কালিদাসের, কোনটি তাঁর নয়। অন্যান্য কবির সাথে কালিদাসের উপমার এতই প্রভেদ।

> “কালিদাসের উপমার এমন এক সাবলীলতা এমন এক লালিত্য, এমন এক উচিত্য আছে, যা অন্যান্য কবির কাব্যে দুর্লভ। হয়ত একই উপমা উভয়েই প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু কালিদাসের লেখনীতে তাহা এক অপূর্ব রমণীয়তা ধারণ করে।”[৮]

‘মেঘদূত’ কাব্যে কালিদাস অজস্রর উপমার ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোনটিই অনাবশ্যক নয়। উপমার পর উপমা দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর শ্লোকের রাজ্য; উপমার প্রাদুর্ভাবে এ রাজ্যখানি হিরার খনির ন্যায় ঝলমলে ও সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। যা দেখে অভিনবগুপ্ত বলেছেন- ‘মহাকবিকাব্য কামধেনু স্বরূপ’। শ্রীযুক্ত পিল্লাই উপমার ক্ষেত্রকে অসীম বিবেচনা করে বলেন, উপমা নটীর ন্যায় বিভিন্ন অলঙ্কারের রূপ পরিগ্রহ করে।’ যদিও অলঙ্কারশাস্ত্রের গোলকধাঁধাঁর অজেয় পরিব্রাবক কালিদাস তাঁর কাব্যে শুধু উপমা নয় সর্বপ্রকার অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন। তিনি জানতেন সব, তাই মানতেন বেশি। একারণে অলঙ্কারকে কবিতার গাঁয়ে স্তরীভূত করে চাপিয়ে দেননি তিনি। প্রয়োজানুসারে কাব্যদেবীর সৌন্দর্যকে সহস্রগুণে বাড়িয়ে তোলার কারণ হেতু মাত্রা বুঝে তিনি অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর কাব্যের সবচেয়ে বড় অলঙ্কার হলো কবির সংযম। দীপক প্রতীপ, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, রূপক, ভ্রান্তিমান, সন্দেহ ইত্যাদি নানাপ্রকার উপমার ব্যবহার দেখি মেঘদূতের পরতে পরতে। উপমা সংগ্রহের জন্য কবি বন, পাহাড়, নদী-নালা-র্পবত-শৃঙ্গ, মৃগ, পক্ষী, জলচর, মনুষ্য, দেবলোক, জ্যোতিলোক, বৈদ্যিক শাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও শিল্পকলার সকল শাস্ত্রের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে শিলা-পাথর-আঁকর ও বিচূলি ফেলে কেবল তুলে এনেছেন মোক্ষপ্রাপ্তির সকল উপকরণ। তাই তাঁর কাব্যে সমুদ্র তরঙ্গের মত একটার পর একটা উপমা আসতে থাকে। তবে উপমা তাঁর কাব্যের কোথাও বহিরাবরণ হয়ে ওঠেনি সেগুলো কবিচিত্তের সুষ্ঠতম বাহনরূপেই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। নদী, নারী আর প্রকৃতি যেন একসূত্রে গাঁথা মেঘদূতের মাঝে। কবিকল্পনার মায়াজালে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই সজীব ও প্রাণবান হয়ে উঠেছে। অসংখ্য নদী নারীর বৈশিষ্ট্য অঙ্গে জড়িয়ে কখনও হয়েছে কামকাতুরা কখনওবা হয়েছে চঞ্চলা। যেমন কবির কাছে রেবা পিপাসাময়ী, বেত্রবতী গুণান্বিতা, নির্বিন্ধ্যা রমণীয়, শিপ্রা উপেক্ষিতা, গন্ধবর্তী সুচতুরা, গম্ভীরা শপরীলোচনা, জাহ্নবী হাসোৎফুল্লা, চর্যশ্বতী কুণ্ঠাকাতরা, সরস্বতী নিঞ্চনযমী। অর্থাৎ সকল নদীকেই কবি নারীর উপমায় উপস্থাপন করে তার মাঝে প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন।

‘দেখবে নদী এক বিন্ধ্যশৈলের উপলবন্ধুর চরনে-
হাতির গায়ে আঁকা চিত্রলেখা যেন শীর্ণ রেবা সেই বিসর্পিতা।’ [শ্লোক-১৯]

অথবা

'তটের কলতানে রূপসী রমণীর ভুরর ভঙ্গিমা সে দেয় এঁকে
উর্মি-চঞ্চল বেত্রবতী সে-ই করবে পান তার মধুর বারি।' [শ্লোক-২৫]

অথবা

' বরং গম্ভীরা নদীর অন্তরে প্রবেশ কোরো তুমি, হে সুন্দর,
অমল হৃদয়ের মতো সে-জলধারা তোমার ছায়ারূপে ধন্য হোক।
চটুল পুটিমাছ লাফিয়ে চলে যেন, ধবল কুমুদের কান্তি-
তেমনি তার চোখে চাহনি।" [শ্লোক-৪১]

অথবা

দেখবে যেতে যেতে স্থলিত, মনোরম ভঙ্গিতে নেয় নির্বিন্ধ্যা
বেনীর মতো ফীন জলের ধারা যার ...
তেমার কারণে যে বিরহলক্ষণ ধারণ করে আছে অঙ্গে-
যাতে সে তটিনীর কার্শ্য হয় দূর, এবার করো সেই চেষ্টা। [শ্লোক-২৯-৩০]

৪৭ নাম্বর শ্লোকে নদীকে ঘিরে অসারধারণ একটি উপমা রয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে আকাশ আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে নদীকে তার গলার মালা মনে হয়। পঞ্চম শতকে অবস্থান করা কালিদাস তাঁর অলৌকিক কল্পনা - প্রতিভা দ্বারা বিষয়টি উত্থাপন করেছেন এভাবে-

'দেখবে যে বিপুল-নদীরে ক্ষীনতনু; যেন এ-পৃথিবীর কণ্ঠে
একক লহরের মুক্তমালা দোলে, মধ্যমণি তার ইন্দ্রনীল।" [শ্লোক-৪৭]

শুধু নদী নয়, পর্বতকেও কবি মেঘের প্রেয়সী হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাই ক্লান্ত মেঘ তার পথের সব ক্লান্তি দূর করতে পর্বতশৃঙ্গ-কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কবি-কল্পনার বিস্তৃত-ভূবনে রামগিরি হয়েছে মেঘের প্রিয়তমা সখা।

'ভুবন-পূজনীয় রাঘব-পদরেখা রয়েছে আঁকা যার মেখলায়,
তোমার প্রিয় সখা তুঙ্গ এই গিরি, বিদায় বলো তাকে তা'হলে।' [শ্লোক-১২]

তেমনি আবার কবি নগরীকে পর্বতের প্রণয়িণীরূপে কল্পনা করেছেন। যেমন-

"প্রণয়ী কৈলাস, এগিয়ে আছে কোলে বিমান-মনোরমা অলকা।" [শ্লোক-৬৪]

রামগিরি থেকে অলকার পূর্বপর্যন্ত যাত্রাপথের মনোরম বর্ণনা পূর্বমেঘ নামে খ্যাত। আর উত্তরপ্রেম এর পটভূমি অলকা যা সৌন্দর্যের লীলাকেতন, নিত্যানন্দের বিহার ভূমি স্বাভাবিক ভাবেই তাই উপমা চয়নে পূর্বমেঘ হতে উত্তরমেঘের দিগন্ত অধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। মেঘ অচেতন জড় পদার্থ হলেও কবি কল্পনায় মেঘ জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে। আর বন্ধুরূপে জগতের সকল বিরহী-হৃদয়ের আকূল বেদনার বার্তা-বাহক হয়ে উঠেছে।

"হে মেঘ, জানি আমি ভুবনাবিশ্রুত তুমি যে পুষ্কর-আবর্তের বংশে জাত '[শ্লোক-৩]
আমার সমাচার, পয়োদ নিয়ে যাও, তুমি যে তাপিতের আশ্রয়!' [শ্লোক-৭]

আবার কালিদাস এই মেঘের সর্বাঙ্গীন বৈশিষ্ট্যেও সাথে অলকাপুরীর সৌন্দরাজিব তুলনা করে কবি নান্দনিক মালোপমার মালা নির্মাণ করেছেন। যেমন- মেঘের যেমন বিদ্যুৎ তেমনি অলকার সুন্দরী রমনী, মেঘের ইন্দ্রজালের প্রাসাদের চিত্রাবলী; মেঘের গম্ভীর গর্জন, প্রসাদের সংগীতের সুরজ রাজ্য; মেঘের অন্তঃস্থিত জলরাশি, প্রসাদের মণিময় ভূমি; মেঘ উচ্চে অবস্থিত, আর অলকার প্রসাদরাজ গগনচুম্বী অবস্থান ইত্যাদি। এই ধরনে মালোপমা প্রয়োগে কালিদাস সিদ্ধহস্ত এবং সাধারণ মহাকাব্যেই এরূপ মালোপমা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

"রয়েছে বিদ্যুৎ ললিত বনিতায়, ইন্দ্রধনু গৃহচিত্রে,
গানের আয়োজনে প্রহত পাখোয়াজে ¯স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ,
স্বচ্ছ ভূমিতল সজল মনে হয়, লেহন করে মেঘে তুঙ্গচূড়া-
সৌধাবলি যেথা এ-সব লক্ষণে তোমারই অবিকল তুলনা।" [শ্লোক সংখ্যা-৬৫]

সৌন্দর্যের সাধক কালিদাস কখনও সৌন্দর্য আহরণ করেছেন প্রকৃতি থেকে। কখনও সৌন্দর্য সৃস্টি করেছেন নারীদেহকে অবলম্বন করে। এ কারণে তিনি প্রায়ই প্রকৃতি ও নারীর উপমা দিয়েছেন, যার ফলে তা স্নিগ্ধ, মধুর, কোমল ও পেলব হয়ে উঠেছে। রমনী হৃদয়ের সাথে ফুলের, নৃত্যরতা বীরাঙ্গনার উদত বাহুর সাথে নৃত্যরত শম্ভুর এবং মেঘের জলধারার সাথ নারী কেশের উপমা কবি দিয়েছেন।

"উত্তেলিতবাহু বন্য তরু যেন, নৃত্য উদ্যত শম্ভু।' [শ্লোক-৩৭]

পিরামিড আকৃতির এই কাব্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত এক নারী-মূর্তি। সেই নারী পাঠকের সবচেয়ে কাক্সিক্ষত ও বাঞ্চিত বিষয়ে পরিণত হয়ে ওঠে যক্ষের দুঃখী চিত্তের উদ্বেল-ভাব লক্ষ্য করে। কালিদাস পাঠককে হতাশ করেন না। নান্দনিক সৌন্দর্য মাখিয়ে সৃষ্টি করেন সর্বমানবের সে মানস-প্রতিমাকে।

"তন্বী, শ্যামা, আর সূক্ষদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা,
জঘন গুরু ব'লে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ব বিম্বের, যুগল স্তনভারে ইষৎ-নতা,
সেখায় আছে সে-ই বিশ্বশ্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা। [শ্লোক-৮৫]

এতো কিছু বলবার পরেও কবির মনে হয় তিনি যেন সেই মানস-কন্যার রূপ বর্ণনে ব্যর্থ, সঠিক উপমা যেন তিনি খুঁজে পান না কোথাও।

"দেখি প্রিয়ঙ্গুতে তোমার তনুলতা, বদন বিশ্বত চন্দ্র,
ময়ূরপুচ্ছের পুঞ্জে কেশভার, চকিত হরিণীতে ঈক্ষন,
কিন্তু, হায়, নেই তোমার উপমান কোথাও একযোগে, চন্ডী।" [শ্লোক-১০৭]

উপমা নির্বাচনে ও উপস্থাপনার অভিনত্বে কবি কালিদাস অনন্য। তাঁর উপমা প্রয়োগের কৌশল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্নিহিত ভাবকে কাব্যদেহে রূপায়নেরই কৌশল। এই কৌশলে সিদ্ধি লাভ করেই কালিদাস তাঁর কাব্যে 'বাক্য' এবং অর্থকে পরমেশ্বরের ন্যায় অভিন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থ, অলঙ্কার ও ভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে 'মেঘদূত' কাব্যে সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যক্ষের বিরহ বার্তার সাথে মিল রেখেই কালিদাস ধীরগতির এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দে প্রতি চরণে বারটি পর্ব থাকে। প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা, ২য় ও তয় পর্বে ৭ মাত্রা এবং চতুর্থ পর্বে ৫ মাত্রা এই ছন্দের সাধারণ প্রথা। মেঘদূতের আনুবাদে বুদ্ধদেব বসুও এই ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তবে শেষ পর্বের মাত্রাব্যাপারে তিনি অনেকখানি স্বাধীনতা নিয়েছেন।

কেমনে প্রিয়তমা রাখবে প্রাণ তার অদূরে উদ্যত শ্রাবণে
যদি-না জলধরে বাহন ক'রে আমি পাঠাই মঙ্গল বার্তা।" [শ্লোক-৪]

বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্বে ও গঠনশৈলীর অনবদ্য নৈপুন্যে 'মেঘদূত' যে কালে সীমানা ডিঙ্গিয়ে কালাতীত কাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে, একথা কারও অবিদিত নেই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয়, যখন রাজসভার বিলাসবাসনা নিভৃত করবার উদগ্রবাসনার আড়ম্বর ও সহস্র বিধিনিষেধের কংক্রিট-কঠিন বেড়াজালের মাঝে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ কাব্যে কালিদাসের সুগভীর জীবনবোধের পরিচয় মেলে। তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে আপন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর কাব্যকে তিনি যুগ ও সমাজের দর্পন স্বরূপ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। একদিকে রাজ-রাজড়াদের নিত্যকর্ম, ভোগ ও অপচয়ের নানা উপকরণে সজ্জিত গৃহকোণ, পুরুষের বহগামীতার কদর্য বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো অতি নান্দনিকভাবে প্রকাশ পেলেও এর অভ্যন্তর চিরে বেরিয়ে আসা কবির দীর্ঘশ্বাস শুনতে শাণিতবোধসম্পন্ন একটি হৃদয়ের প্রয়োজন হয়। কাব্যটি বহিরাঙ্গে সামন্তরাজাদের অতিপ্রিয় রোমান্স বহন করলেও অন্তরঙ্গে ধারণ করে আছে সাধারণ, অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত মানুষের কথা। খুব অল্প হলেও এখানে গ্রামের কথা এসেছে, শহরের কথা এসেছে। এসেছে শ্রেণি-বৈষম্য, মদ্যপ পুরুষদের বহু নারীতে আসক্তি , নারীর একমুখী ও পদপনত অবস্থা, পতিত নারীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদী বিষয়সমূহ। দু'একটি রেখা চিত্রের মধ্য দিয়ে হলেও কবি সামন্ত-পেষণ, কৃষকের কান্না ও উচ্চপদস্থদের একচেটিয়া ভোগের অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। আড়ালে অন্তরালের কথা প্রকাশের এই শক্তির কারণেই কালিদাস মহাকবি।

"তখন খন্ডিতা নারীর আঁখিজল শান্ত ক'রে দেবে প্রণয়ী

সূর্য ফিরে এসে সিক্ত নলিনীর কমল-মুখ থেকে সরাবে শিশির-আশ্রুর চিহ্ন।" [শ্লোক-৪০]

খন্ডিতা নারী হলো তারা যাদের স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত। কবি এখানে বলেছেন, তৎকালে নারীর আপন মত ও মান প্রকাশের স্বাধীনতা এতই কম ছিল যে, পরকীয়ায় আসক্ত পতি সারা রাত নিকৃষ্ট কর্মে রত থেকেও সকালে তার অশ্রু মুছে দিলেই সে নিজেকে ধন্য মনে করতো; রাগ-ঘৃণা বা অভিমান প্রকাশের মতো দৃঢ়তা তাদের চরিত্রে ছিল না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মানসিক ও শারিরীক দাসত্বের বিষয়টি উপরিউক্ত শ্লোকে স্পষ্টতা পেয়েছে। এছাড়া আরও নানা ভাবে বিদ্যৎ ঝলকের ন্যায় কবি নারীর শৃঙ্খলিত অমানবিক দশার কথা প্রকাশ করেছেন। নারী-দেহ লোভে প্রমত্ত সামন্ত প্রভুদের মনোরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় হলো নারীকে কর্মে, ধর্মে , মেধায় ও মননে ক্ষীণকায় করে তার বক্ষ ও পশ্চাৎ-ভাগকে মাংসবহুল করে তোলা। এবং সে কাজটি নিষ্ঠার সাথে করেছেন কবি কালিদাস। এখানে চিত্রিত সকল প্রকার নারীর একমাত্র আরাধনা হলো পুরুষ-সঙ্গীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থেকে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করা। এ কারণে পতি বিরহে তারা মৃতপ্রায় হয় আর পতি অন্য নারীতে আসক্ত হলে তারা উৎকণ্ঠায় ক্রন্ধনরত থাকে। এককথায় , মেঘদূতের জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অবস্থান করা সকল নারী কেবল পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হবার বাসনায় উদগ্রীব। কালিদাসের কৃতিত্ব হলো, এ হেন বিষয়সমূহ অতি সূক্ষ্মভাবে হলেও তার কাছে নিন্দিত হয়েছে। ভোগের চেয়ে ত্যাগের মহিমা প্রাধন্য পেয়েছে । এবং প্রিয়ার বিরহে যক্ষের মৃতপ্রায় বিরহী দশাকেই বড় করে দেখান হয়েছে। আর ধীরে ধীরে যক্ষের বিরহকে কবি সকল মানবের বিরহ-বেদনার সাথে একাত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী:

১ . বাংলাপিডিয়া, সমবারু চন্দ্র মহন্ত
২ . ইতিহাস অভিধান (ভারত), যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০
৩ . কালিদাসের মেঘদূত, অনুবাদক বুদ্ধদেব বসু, বোধি প্রেস, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭
৪ . বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,কলকাতা, ১৩৬০
৫ . John Dryden (1762). "The Dramatick Works of John Dryden, Esq: In Six Volumes", p.196
৬ . রবীন্দ্র-রচনাবলী, মেঘদূত, মানসী, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৫
৭ . সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল চরিত-মানুষ ,কলকাতা, ভারত: ডে'স পাবলিশিং, ১৯৯০
৮ . বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য,কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা জিজ্ঞাসা ,কলকাতা, পৃ-১৯৭, ১৯৬৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১.বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ সাহিত্যিক, হায়াৎ মাহমুদ, সাহিত্য প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৭।
২. কালিদাস সমগ্র, জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পাদিত. নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২।
৩. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৯।
৪. কালিদাস গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, পন্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী কর্পোরেশন লি. (বসুমতী সাহিত্য মন্দির), কলকাতা।
৫. কালিদাসের মেঘদূত, রাজশেখর বসু, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, মাঘ, ১৩৯৮ সং, 'ভূমিকা'